শিক্ষার শিকড় খুঁজে বের করতে হবে

ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী

৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:২৬

একটি জাতির উন্নত ও আধুনিক হিসেবে গড়ে ওঠার মূল শক্তি হলো শিক্ষা। এটিকে গাছের শিকড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যদি শিক্ষার শিকড় শক্ত কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তা হলে তা প্রকৃত শিক্ষায় পরিণত হতে পারে। কিন্তু সেটি যদি না হয়, তা হলে গতানুগতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার প্রকৃত লক্ষ্য খুঁজে না পেয়ে বিপথগামী হয়। শিক্ষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললেও তা এখনো সর্বজনীনভাবে সমাদৃত হয়নি। ফলে শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ কী হবে, তা নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উন্নত, পরীক্ষিত ও স্বীকৃত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও অনেকে বলে থাকেন তা আমাদের দেশের জন্য উপযোগী নয়। কিন্তু কেন উপযোগী নয়, এর যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। বরং এটি অনেকটা নিজেস্ব ধারণা থেকে বলা হয়ে থাকে। এর কারণ হলো, আমাদের দেশে শিক্ষা নিয়ে তেমন কোনো ধারাবাহিক গবেষণা নেই।

শিক্ষা নিয়ে ভাবার জন্য বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, মনোবিদ, সমাজবিদসহ রাষ্ট্র ও সমাজের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বদের নিয়ে কোনো দীর্ঘমেয়াদি কমিটি নেই। শিক্ষার পরিবর্তনশীলতা ও সমৃদ্ধকরণে কোনো শিক্ষা সম্পৃক্ত গবেষণা কেন্দ্র নেই। বিষয়টিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়Ñ কোনো প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও উৎকর্ষতা হঠাৎ করেই ঘটে না। মৌলিক ও ফলিত গবেষণার মাধ্যমে এর সমৃদ্ধকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে কয়েক শতাব্দী ধরে। একইভাবে কোনো একটি শিক্ষাব্যবস্থার নীতিমালা প্রণীত হলেও তা যে অবস্থায় প্রণীত হয়েছিল, ওই অবস্থায় থেকে যায়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে শিক্ষার পরিবর্তনশীলতাকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষানীতির সমৃদ্ধকরণের বিষয়টি ভাবা হয় না। আরেকটি বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো, কোনো একটি নীতিমালা তৈরি করে তা বাস্তবায়নের কথা বলা হলেও এর সাফল্য বা ব্যর্থতার কোনো অনুসন্ধানের ব্যবস্থা নেই। এটি যে শুধু শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা নয়। যে কোনো বিষয়ে নীতিমালা করার পর এর প্রয়োগের ফল বিশ্লেষণ করা হয় না। কিন্তু সবক্ষেত্রেই প্রথমে সুচিন্তিত পরিকল্পনা, এর বাস্তবায়ন ও এটি বাস্তবে প্রয়োগের ফলে ফিডব্যাক

নেওয়ার সংস্কৃতি বা মনোভাব এখনো আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। এটি আত্মসমালোচনার মাধ্যমে গড়ে তোলা দরকার। তবে জাতি হিসেবে আমরা একটি জায়গায় খুব বেশি ভুল করি। তা হলো, আত্মসমালোচনাকে অনেকেই উদারতা বা উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে না ভেবে দুর্বলতা হিসেবে চিন্তা করেন। এই নেতিবাচক ধারণা থেকে আত্মসমালোচনাকে ইতিবাচক সংস্কৃতির ধারায় নিয়ে আসা দরকার। আর সবক্ষেত্রে সেটি হলে আত্মোপলব্ধির সঙ্গে জবাবদিহি নিশ্চিত হবে। যদিও বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অন্যান্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার চেয়ে আধুনিক, অগ্রসরমান এবং বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিক সফল ও ফলপ্রসূ, তবুও এটিকে নেতিবাচক হিসেবে না নিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে হবে। এ ছাড়া বিষয়টিকে দৃষ্টান্ত দিয়ে যৌক্তিক করতে হবে। বলা যায়, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা বাংলাদেশ সবার আগে গ্রহণ করেছিল। আর এটি সফল ও কার্যকর প্রমাণিত হওয়ায় ভারতের মতো রাষ্ট্র আমাদের অনুসরণ করে ডিজিটাল ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখছে।

শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে একেবারে শৈশব থেকে হাতে-কলমে শেখানোর মাধ্যমে শিক্ষাদান করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে যেমন কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটবে ঠিক তেমনি বাস্তবজীবনে এটি প্রয়োগ করে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার রোড আইল্যান্ড স্কুলের বিষয়টি বিবেচনায় আনা যায়। এই স্কুলের বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষাদান করা। একেবারে শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভ থেকে কোনো শিক্ষার্থী প্রকৃত অর্থে যে বিষয়ে শেখার প্রতি আগ্রহী হয়, ওই বিষয়েই হাতে-কলমে জ্ঞানার্জন করতে পারে। পেশা হিসেবে পছন্দের কাজ বেছে নিতে সহায়ক হবেÑ এ ভাবনায় এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের সঙ্গে মিলে একত্র হয়ে কর্মক্ষেত্রে কাজ করে। এর পক্ষে যে যুক্তি রয়েছে, তা হলো ওই শিক্ষার্থীরা একদিন তাদের পছন্দের কাজকেই পেশা হিসেবে বেছে নেবে। তাই শৈশব থেকেই কোনো শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে যে ধরনের কাজ করার স্বপ্ন দেখে, এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যোগ্য করে শিক্ষাদান করাই ওই স্কুলটির কৌশল ও শিক্ষা পদ্ধতি।

advertisement

বর্তমানে আমেরিকার মতো উন্নত রাষ্ট্রের ৫৫টি স্কুলে এই ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। তা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ভাবা যেতে পারে। পৃথিবীর এক নম্বর শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা হয়। ২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ওই দেশটির শিক্ষাব্যবস্থা প্রোগ্রাম ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এখানে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্যÑ তা হলো রিডিং, গণিত ও বিজ্ঞানে ফিনিশ শিক্ষার্থীরাই পৃথিবীর সেরা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। উন্নত, জীবনধর্মী এবং বাস্তবমুখী শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ফিনল্যান্ডের পরই রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর ও জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা। অথচ অবাক করার মতো বিষয় হলো, এই দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের দেশের মতো পরীক্ষায় বসিয়ে গতানুগতিক পদ্ধতিতে মেধা যাচাই করা হয় না। আবার হোম ওয়ার্ক ও অ্যাসাইনমেন্টের বিষয়টিও এখানে মুখ্য নয়। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবেষকদের আগ্রহের বিষয় হলো ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা। ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার ‘হৃৎপি-’ হিসেবে বিবেচনা করা হয় ওই দেশের শিক্ষকদের। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে মৌলিক কিছু নীতি থাকলেও তাদের প্রতি বিশ্বাস ও স্বাধীনভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শিক্ষকদের মূল উদ্দেশ্য হলো কীভাবে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল করে গড়ে তোলা ও শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করা যায়। কীভাবে শিক্ষার্থী সহজে এবং ভালোভাবে কোনো একটি বিষয়ে মনোযোগী হতে পারে, এই বিষয়গুলো কেন্দ্র করে শিক্ষকরা তাদের মেধা ও মননশীলতা প্রয়োগ করেন।

অনেক বছর আগে আমাদের কাছের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আনন্দের সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণের কথা বললেও সেটি আমাদের দেশে প্রচলিত নেই। কিন্তু ফিনল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশে এটিকে শিক্ষার মুখ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এসব দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তথাকথিত মেধার মূল্যায়নের চেয়ে শিক্ষার্থী কী শিখল, কীভাবে শেখাতে হবে, কীভাবে জীবনযাপন করতে হবে অথবা কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে নিজের আগ্রহের ও নতুন সৃষ্টির ভাবনাÑ এ বিষয়গুলোকেই প্রাথমিক পর্যায়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ তারা মনে করেন, প্রকৃত সাফল্য ও বিজয় ভারসাম্যহীন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব নয়।

যদি জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা বিবেচনা করা হয়, তা হলে দেখা যায় এখানে প্রথমত, নৈতিকতা শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। চিরাচরিত বিষয় ছাড়াও জাপানের ক্যালিগ্রাফি ও কবিতা সম্পর্কে জানতে হয়। আর জীবনাচারণ শেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে এখানেও প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষাকে মেধা যাচাইয়ের নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচনা না করে দেখতে দেখতে শেখা ও জীবনকে জানাÑ এ বিষয়গুলোর প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষাভীতি ও বইয়ের বোঝা শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তৈরি করে। একেবারে প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা শিক্ষার্থী মূল্যায়নের সঠিক প্রক্রিয়া না হয়ে তা বরং শিক্ষর্থীদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তৈরি করছে। আরেকটি বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। তা হলো, শিক্ষা মন ও দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা তৈরি না করে মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা তৈরি করছে। তা মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিরূপ প্রভাব রাখতে পারে। যখন কোনো শিক্ষার্থীকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে বলে অভিভাবকরা শৈশব থেকে তাদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করেন, তখন তাদের চিন্তাজগতের সীমা কমে আসে এবং তার উদার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হওয়ার জায়গাটি বাধাগ্রস্ত হয়। এটি এ কারণে বলা হচ্ছেÑ যখন কোনো মানুষের ওপর তার মনের বাইরে কোনো একটি বিষয় আরোপিত করা হয়, তখন তার নিজস্ব চিন্তাধারা গড়ে ওঠে না। তার মধ্যে এক ধরনের স্বার্থপরতা তৈরি হয়। ফলে সে তার আশপাশের সবাইকে মানবিক দৃষ্টিতে না দেখে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কল্পনা করে। প্রকৃত একজন সমাজ ও রাষ্ট্রের মানুষ হিসেবে সে গড়ে ওঠে না। কিন্তু কোনো শিক্ষার্থীকে যদি বলা হতো শিক্ষার মাধ্যমে তাকে প্রকৃত মানুষ হতে হবে, তা হলে তা সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হতো। ফলে তার মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজের সবাইকে এগিয়ে নেওয়ার নিঃস্বার্থ গুণাবলি গড়ে উঠত। এখানে সমাজের প্রচলিত এককেন্দ্রিক মানসিকতা শিক্ষার লক্ষ্যকে ব্যর্থ করছে। আরও যে বিষয়টি চলে আসে, তা হলো শিক্ষার কারণে এককেন্দ্রিক মানসিকতা তৈরি হচ্ছে, নাকি মানসিকতার কারণে শিক্ষা তার গতিপথ হারাচ্ছে! তবে একটি অন্যটির যে পরিপূরক, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললেও শিক্ষার মাধ্যমে নতুন শিক্ষার সৃষ্টি, উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ ও অন্তর্নিহিত ভাবনার বিষয়টি কেন মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করছে নাÑ তা সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা উচিত। তবে আশার কথা হচ্ছে, বর্তমান সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ফিনল্যান্ড ও সুইডেনÑ এ দুই দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষা পিছিয়ে থাকার কারণ ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে উন্নত ও জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেখানে বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে পরীক্ষিত ও আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি বিদ্যমান আছে, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমাদের দেশে প্রচলনের উদারতা দেখাতে হবে। আর এটি যদি সম্ভব হয়, তা হলে আমাদের দেশও সেরা শিক্ষাব্যবস্থার সূতিকাগার হিসেবে চিহ্নিত হবে।

য় অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী : শিক্ষাবিদ, কলাম লেখক; ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট), গাজীপুর